‘আমি হিমালয় দেখিনি, শেখ মুজিবকে দেখেছি’ ফিদেল ক্যাস্ট্রোর দেখা এই বিশাল রাষ্ট্রনায়ক আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলেবেলা কেমন ছিল? টুঙ্গিপাড়ার সাধারণ এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্ম নেয়া এ মানুষটির বেড়ে ওঠা যেমন বর্ণিল, তেমনি চমকপ্রদ। কন্যা শেখ হাসিনার এক লেখায় তিনি এভাবে উঠে এসেছেন, ‘আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠোপথের ধুলোবালি মেখে। বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কীভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা, দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোট ছোট ছেলের সঙ্গে করে মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তার ভালো লাগত। ছোট্ট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তার কথামতো যা বলতেন তাই করত।’

খেলাধুলা, পাখি ধরা, মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও তিনি সে সময় বাড়িতে খুব পড়াশোনাও করতেন। বিশেষ করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা তিনি নিয়মিতই পড়তেন। বাড়িতে বাবা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। এসবই সে সময়ের জনপ্রিয় পত্রিকা। সে সময়ের শিক্ষিত পরিবার মাত্রই এসব পত্রিকা বাড়িতে রাখতেন। ছোটবেলা থেকে এসব পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় থাকার কারণে ছোট্ট মুজিবের সামনে বিপুলা পৃথিবীর এক দরাজ দরজা খুলে গিয়েছিল।

একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে অসাধারণ হয়ে উঠলেন, তা জানার আগ্রহ থাকাটা পাঠকদের খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে এ দেশের তরুণরা জানতে আগ্রহী, কী করে তিনি হয়ে উঠলেন স্বদেশের প্রতিচ্ছবি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানার একমাত্র উপায় ছিল তার ভাষণগুলো এবং তৎকালীন পত্রপত্রিকাগুলো। তাকে নিয়ে প্রচারিত খবরাখবর স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজিতে বিতর্কিতভাবে উপস্থাপিত হতো। তবে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটতে থাকে তার ও তার স্বজনদের লেখা কিছু গ্রন্থ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ও গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনারও কিছু লেখা আছে। বিশেষ করে ‘শেখ মুজিব আমার পিতা’, ‘স্মৃতির দখিন দুয়ারÑ এক-দুই’ লেখাগুলো থেকে বঙ্গবন্ধুকে সম্পর্কে অনেক অজানা কথা জানা যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তথ্য আহরণের একটি আকর গ্রন্থ। তারপরও এই মহান নেতার অনেক অজানা অধ্যায়ই চোখের আড়ালে রয়ে যাচ্ছিল। ২০১২ সালে যখন প্রথম বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রকাশিত হয়, তখন অনেক অদেখা ভুবনের দরজা খুলে যায় আমাদের চোখের সামনে। নিজের জবানীতেই আমরা তার সম্পর্কে জানতে পারি। সেটি আমাদের আরও কিছু পূর্ণ হয়Ñ যখন ২০১৭ সালে তার ‘কারাগারের রোজনামচা’ বের হয়। তার আরও কিছু ডায়েরি, রোজনামচা প্রকাশের অপেক্ষায়। সেসব একসঙ্গে হাতে পেলে তার পরিপূর্ণ জীবন আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে নতুন আলোকে। সম্প্রতি শেখ হাসিনার সম্পাদনায় বেরিয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু গোয়েন্দা প্রতিবেদন। ‘সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দা নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ নামে দুটো খ- প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের অপেক্ষায় আছে আরও ১২টি খ-। এগুলো প্রকাশিত হলে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব। এসব তার

রাজনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্ত। কিন্তু তার ছেলেবেলা সম্পর্কে জানার উপায় আমাদের হাতে আছে খুব অল্পই। তাকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন, তার বন্ধু, আত্মীয়স্বজনÑ তারা কিছু কথা জানিয়েছেন। আর তার বড় কন্যা শেখ হাসিনাও অনেক গল্প শুনেছিলেন তার দাদির মুখে, সেসবও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন কিছু। তবে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশি জানতে পারি তার 'অসামপ্ত আত্মজীবনী' থেকেই।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমি খেলাধুলাও করতাম। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতাম। খুব ভালো খেলোয়াড় ছিলাম না। তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে ভালো অবস্থান ছিল। এই সময় আমার রাজনীতির খেয়াল তত ছিল না।'

শুধু খেলাধুলার খবর নয়, বংশ পরিচয়, লেখাপড়া এবং অনেক চমকপ্রদ গল্প জানা যায় অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে। যেমন তার বিয়ের খবরটি। এ নিয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন, "একটা ঘটনা লেখা দরকার, নিশ্চয়ই অনেকে আশ্চর্য হবেন। আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বারো-তেরো বছর হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পরে ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, 'তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনির বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।' রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হলো। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধহয় তিন বছর হবে। রেণুর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা মারা যায়। একমাত্র রইল তার দাদা। দাদাও রেণুর সাত বছর বয়সে মারা যান। তারপর, সে আমার মা'র কাছে চলে আসে। আমার ভাইবোনদের সাথেই রেণু বড় হয়।"

এমন আরও অনেক অবাক করা গল্প আছে তার ছেলেবেলার। তিনি যে একদিন অনেক বড় কিছু হবেন, তার কিছু নজির খুঁজে পাওয়া যায় তার ছোটবেলাতেই। শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশোনা করত। চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেক দূরে হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংকপাড়ায়, আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধ-ভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটি ছাতা কিনতে হতো। কারণ আর কিছুই নয়, কোন ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ, রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাকে ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন। দাদির কাছে গল্প শুনেছি, যখন ছুটির সময় হতো তখন দাদি আমগাছের নিচে এসে দাঁড়াতেন। খোকা আসবে দূর থেকে রাস্তার ওপর নজর রাখতেন। একদিন দেখেন তার খোকা গায়ের চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে, পরনের পায়জামা-পাঞ্জাবি নেই। কী ব্যাপার? এক গরিব ছেলেকে তার শত ছিন্ন কাপড়ে দেখে সব দিয়ে এসেছেন।'

তিনি যে দরিদ্র মানুষের বিপন্নতায় বিচলিত হতেন, তার প্রমাণ মেলে ছোটবেলার আরেকটি ঘটনায়। ‘একবার তার গ্রামের চাষিদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কৃষকদের জীবনে নেমে আসে অভাব-অনটন। অনেক বাড়িতেই দুবেলা ভাত রান্না বন্ধ হয়ে যায়। চাষিদের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা। তাদের সন্তানরা অভুক্ত। সারা গ্রামেই প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা নিয়ে চাপা গুঞ্জন। কিশোর মুজিব এ রকম পরিস্থিতিতে দুঃখ-ভারাক্রান্ত। কিন্তু কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। একটা কিছু করার জন্য তিনি ছটফট করছিলেন। সে সময় যে পথটি তার সামনে খোলা ছিল, তিনি তাই করলেন। নিজের পিতাকে তিনি তাদের গোলা থেকে বিপন্ন কৃষকদের মধ্যে ধান বিতরণের জন্য অনুরোধ জানালেন। তাদের নিজেদের ধানের মজুদ কেমন, এই অনুরোধ তার বাবা রাখতে পারবেন কিনা, সেসব তিনি ভাবেননি। কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখার চিন্তাটিই ছিল তখন তার কাছে মুখ্য।’

এমন আরও অনেক ঘটনার সমারোহে বঙ্গবন্ধুর শৈশব, কৈশোর কেটেছে। মুজিব তার পূর্বপুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। এ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে বাবার কাছে গোপালাগঞ্জ পাবলিক স্কুলে গিয়ে ভর্তি হন। এর পেছনে একটা ঘটনা আছে। এ নিয়ে শেখ হাসিনা লিখেছেন, ‘একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এর পর আমার দাদি তাকে আর ওই স্কুলে যেতে দেননি। আর একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তার এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট!’

পিতার কর্মস্থল ছিল গোপালগঞ্জ শহরে। তার পিতা ছিলেন একজন সরকারি চাকরিজীবী। সেখানে গিয়ে তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। মাদারীপুর হাইস্কুলেও তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করেন। তাও পিতার বদলিজনিত কারণেই। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় ১৯৩৪ সালে তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। চিকিৎসার জন্য কলকাতা যেতে হয়। ফলে দু-তিন বছর তার পড়াশোনা বন্ধ থাকে। গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত চোখ অপারেশন করাতে হয়। তা না হলে অন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। অপারেশনের পর চোখ ভালো হয়। কিন্তু চশমা হয় তার নিত্যসঙ্গী। ১৯৩৬ সাল থেকেই তিনি নিয়মিত চশমা পরছেন। তিন বছর পর মুজিব পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন ১৭ বছর বয়সে। সহপাঠীরা অনেক এগিয়ে গেছে বলে মাদারীপুরের পুরনো স্কুলে ভর্তি হলেন না। বাবা তাকে এনে আবার গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর বাড়িতে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হলো আবদুল হামিদ এমএসসিকে। মুজিবের মানসলোক গঠনে এই শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। মুজিবের ভাষ্যতেই জানা যাক সেই মাস্টার সাহেবের কথাÑ ‘‘মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা ‘মুসলিম সেবা সমিতি’ গঠন করেন, যার দ্বারা গরিব ছেলেদের সাহায্য করতেন। মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠাতেন সকল মুসলমান বাড়ি থেকে। প্রত্যেক রবিবার আমরা থলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাল উঠিয়ে আনতাম এবং এই চাল বিক্রি করে তিনি গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষা ও অন্যান্য খরচ দিতেন। ঘুরে ঘুরে জায়গিরও ঠিক করে দিতেন। আমাকেই অনেক কাজ করতে হত তার সাথে। হঠাৎ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তখন আমি এই সেবা সমিতির ভার নিই এবং অনেক দিন পরিচালনা করি।’

তিনি ছিলেন ওই সমিতির সাধারণ সম্পাদক। আরেক শিক্ষক সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তী জীবনে যে মুজিব আর্তমানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাতেই বোঝা যায় ছেলেবেলার এ ঘটনা তার জীবনে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল। শুধু মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ করা নয়, মুসলিম সেবা সমিতিতে কাজের অভিজ্ঞতা তার সাংগঠনিক দক্ষতাও বাড়িয়েছিল। সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগের কারণেই তিনি আজীবন সংলগ্ন হতে পেরেছিলেন মাটি ও মানুষের। সাধারণ মানষের দুঃখ-বঞ্চনা অনুভবের দীক্ষা তিনি ছোটবেলাতেই পেয়েছিলেন।

আগামী মার্চ মাসের মাসের ১৭ তারিখ তার জন্মের শতবার্ষিকী পূর্ণ হবে। তিনি জন্মেছিলেন ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকী পালনের জন্য এ বছরটিকে ঘোষণা করা হয়েছে মুজিববর্ষ। আড়ম্বতার সঙ্গে তার জন্মোৎসব পালন করার জন্য এর মধ্যেই শুরু হয়েছে নানা আয়োজন। তার নাম রেখেছিলেন তার নানা। শেখ হাসিনার লেখা থেকে জানা যায়, “আমার আব্বার নানা শেখ আবদুল মজিদ আমার আব্বার আকিকার সময় নাম রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমার দাদির দুই কন্যাসন্তানের পর প্রথম পুত্র সন্তান আমার আব্বা আর তাই আমার দাদির বাবা তার সমস্ত সম্পত্তি দাদিকে দান করেন এবং নাম রাখার সময় বলে যান, ‘মা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে, নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে।”

নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধুর নানার কথা সত্যি হয়েছে। আজ জগৎজোড়া তার খ্যাতি। আমরা যাকে আজ ভালোবেসে বঙ্গবন্ধু বলে ডাকি, ছোটবেলায় মা-বাবা তাকে আদর করে ডাকতেন ‘খোকা’। ভাইবোন ও গ্রামের ¯েœহধন্যরা ডাকত ‘মিয়াভাই’। মুরুব্বিরা ডাকতেন ‘মজিবর’ অথবা ‘মুজিবুর’। পরে সহকর্মীরা ডেকেছেন ‘মুজিব ভাই’। স্বাধীনতার আগে-পরে দেশের প্রবীণ মানুষজনের কাছে তার পরিচয় ছিল ‘শেখ সাব’। একই মানুষের কত নাম! সব নামের সঙ্গেই মিশে আছে কী গভীর মমতা আর ভালোবাসা! আজ শ্রদ্ধাভরে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে পূর্ণ নামে ডাকা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছোট করে সবাই ডাকি বঙ্গবন্ধু নামেই।

ছেলেবেলাতেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তার সারাজীবনেরই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার পুরো রাজনৈতিক জীবনে এটা খুব বড় একটা টার্নিং পয়েন্ট। ১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরেবাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। আর সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। তারা গোপালগঞ্জে আসবেন। বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। শেখ মুজিব তখন মিশন স্কুলে পড়েন। দেখতে একটু বড় হওয়ার কারণে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের দায়িত্ব পড়ল তার ওপর। সভা শেষে হক সাহেব গেলেন পাবলিক হল দেখতে আর শহীদ সাহেব গেলেন মিশন স্কুল দেখতে। শেখ মুজিব দলবল নিয়ে তাকে সংবর্ধনা দিলেন এবং জানালেন, স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি পড়ার কথা। তাই তাকে ওয়াদা করে যেতে হবে যেন ছাদ শিগগিরই ঠিক করে দেওয়া হয়। সোহরাওয়ার্দী এই তরুণতুর্কির কথায় চমৎকৃত হলেন। স্কুল পরিদর্শন শেষে সোহরাওয়ার্দী লঞ্চঘাটের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। মুজিবও তার সঙ্গে হেঁটে চলেছেন। যেতে যেতে সোহরাওয়ার্দী ভাঙা ভাঙা বাংলায় মুজিবের নাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। এক সরকারি কর্মচারী মুজিবের নাম বলে তার বংশ পরিচয়ও দিলেন। শেখ মুজিব ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন এভাবেÑ “তিনি আমাকে ডেকে নিলেন খুব কাছে, আদর করলেন এবং বললেন, ‘তোমাদের এখানে মুসলিম লীগ করা হয় নাই?’ বললাম, ‘কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। মুসলিম লীগও নাই।’ তিনি আর কিছুই বললেন না, শুধু নোটবুক বের করে

আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিলেন। কিছুদিন পরে আমি একটা চিঠি পেলাম, তাতে তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং লিখেছেন কলকাতা গেলে যেন তার সঙ্গে দেখা করি। আমিও তার চিঠির উত্তর দিলাম। এইভাবে মাঝে মাঝে চিঠিও দিতাম।' আর এভাবেই গড়ে ওঠে বাঙালির রাজনৈতিক মঞ্চে গণতন্ত্রের সংগ্রামে গুরু-শিষ্যের এক অনন্য যুগলবন্দি।